তুলি-কলম

সার্ধশতবার্ষিক স্মরণ : স্যার যদুনাথ সরকার

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

পদ্মাবিধৌত সুজলা সুফলা রাজশাহি জনপদ। সেখানের ছেলেমানুষ ছেলেটি খেলার ফাঁকে বা পড়ার ফাঁকে প্রায়ই তার মায়ের কাছে ছুটে আসে। একটু আদর পেলেই সে মহাখুশি। আর রাতের বেলা মায়ের পাশটিতে তাকে শুতে হবেই। একদিন মা কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, ''ঘুমের ঘোরে বড্ড পা ছুঁড়িস, ঠিকভাবে যদি শুতে না পারিস তাহলে তুই কাল থেকে আমার কাছে আর শুবি না।'' পরের রাতে শুতে এসে দেখেন তাঁর শান্ত ছেলে পা দুখানি দড়ি দিয়ে বেশ করে বেঁধে নির্দিষ্ট জায়গায় শুয়ে রয়েছে।

১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি। কলকাতার স্বাধীনতা-পূর্ব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গুরুতর আহত হয়ে মারা গেছেন মানুষটির বড় ছেলে। সমবেদনা জানাতে এসে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার আর বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা বিহ্বল হয়ে দেখলেন, তিনি যেন নির্বিকার, নিচের ঘরে একমনে পড়াশোনা করছেন। রমেশচন্দ্র বলেই ফেললেন, ''এ আপনি কী করছেন?'' মানুষটি দুই শুভানুধ্যায়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, ''আপনারা আমাকে কী করতে বলেন?''

দুটি ঘটনার মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান তো রয়েছেই, সময়কালের ব্যবধানও প্রায় সাত দশকের। মিল শুধু এইটুকুই, দুটি কাহিনি একই জনকে ঘিরে : ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার (১০ ডিসেম্বর ১৮৭০—১৯ মে ১৯৫৮)। জন্মের সার্ধশতবর্ষ পেরিয়ে এসেও মৌলিক গবেষণা তথা উচ্চ শিক্ষাজগতে যাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর এখনও অমলিন।

তাঁর জীবন ও সাধনা নিয়ে কথা শুরু করার আগে এই দুই ঘটনার দিকে ফিরে তাকালাম—একটি তাঁর অঙ্কুরোদ্গম কালের, অপরটি যখন তিনি বনস্পতি। তাঁর জীবনব্যাপী অবিচল মূল্যবোধ আর একনিষ্ঠ প্রত্যয় অনুধাবনে হয়তো এতে সুবিধে হবে।

শেকড় সন্ধান

বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার কড়চমারিয়া গ্রামে যদুনাথ সরকারের জন্ম। বাবা রাজকুমার সরকার (১৮৩৯—১৯১৪) এবং মা হরিসুন্দরী দেবীর (১৮৪৭—১৯৩৯) সাত পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে যদুনাথ ছিলেন তৃতীয় পুত্র, পঞ্চম সন্তান। তাঁর মাতামহ শ্যামাচন্দ্র রায় ছিলেন পাবনার মালঞ্চী গ্রামনিবাসী বিশিষ্ট বৈষ্ণব সংস্কৃতজ্ঞ।

পিতামহ নিমাইচাঁদ সরকার ছিলেন কড়চমারিয়া এলাকার বিশেষ প্রতিপত্তিশালী জমিদার।

শেষ জীবনে 'আমার জীবনের তন্ত্র' সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক নাতিদীর্ঘ রচনায় যদুনাথ জানিয়েছিলেন, ''যাঁকে দেখে আমি নিজ জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য স্থির করতে পেরেছি, তিনি আমার পিতা...। ধনী, জমিদার-সন্তান এবং ইংরাজি-শিক্ষিত হলেও তিনি কখনও ভোগসুখ বা আড়ম্বর চাহেন নাই; চিরদিন সরল সংযত জীবনযাপন করেছিলেন। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল, আমাদের রাজশাহী জেলার সব রকম লোকহিতকর কাজে নিজেকে নিয়োগ করা।'' স্থানীয় 'রাজশাহি অ্যাসোসিয়েশন অফ জমিন্দার্স'-এর প্রাণপুরুষ হিসেবে তিনি জেলার সব ভূস্বামীদেরই পরামর্শদাতা ছিলেন। নিজের ক্ষুদ্র জমিদারিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন করে কড়চমারিয়াকে এক আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলেন। তাঁর উদ্যোগেই স্নাতকস্তরের লেখাপড়ার জন্য রাজশাহি কলেজের প্রভূত উন্নতি ঘটে। রাজশাহি শহরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে-ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেন তার সদস্য ছিলেন মুক্তমনা বৈষ্ণব রাজকুমার সরকার।

রাজকুমারের আর এক কীর্তি তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। এক সুপ্রশস্ত হলঘরে কাঁচের পাল্লাবিশিষ্ট দশফুট লম্বা ও পাঁচ ফুট চওড়া ছয়টি সেগুন কাঠের পালিশ করা আলমারি। আর তাতে সযত্নে গোছানো থাকত নানা সূত্র থেকে যথেষ্ট অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করে আনা নানা অমূল্য বাংলা ও ইংরেজি বই ও পত্রিকা। বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ছিল ইতিহাস থেকে বিজ্ঞান, সাহিত্য থেকে অর্থনীতি, দর্শন থেকে শিল্প। পিতার এই গ্রন্থাগারের হাত ধরেই কিশোর যদুনাথের জ্ঞান চর্চা শুরু। এখানেই তিনি পড়েছেন রাসেলের 'History of England', গ্রিস ও রোমের ইতিহাস। পরিণত বয়সে যদুনাথ পিতার স্মৃতিচারণ করেছেন, ''ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য। তিনি আমার বালকচিত্তে ইতিহাসের নেশা জাগিয়ে দেন।''

প্রস্তুতিপর্ব

যদুনাথের লেখাপড়া শুরু হয় তাঁদের গ্রামে, তাঁর বাবার প্রতিষ্ঠিত শম্ভুনাথ 'পণ্ডিতকাকা'র পাঠশালায়। সেখানে দুবছর প্রাথমিক লেখাপড়ার পর তিনি স্কুলজীবনে অনেকবার ঠাঁইনাড়া হন। রাজশাহি কলেজিয়েট স্কুলে বছরখানেক পড়েই দুই দাদার সঙ্গে তাঁকে পাঠানো হয় কলকাতায়। সেখানে এক বছর হেয়ার স্কুলে তখনকার নবম শ্রেণিতে পড়ার পর ভর্তি হন সিটি কলেজিয়েট স্কুলে। কলকাতায় দুবছর পড়াশোনার পর তিন ভাইকে ফেরত নিয়ে যাওয়া হয়। যদুনাথ আবার ভর্তি হন রাজশাহি কলেজিয়েট স্কুলে। এবার পঞ্চম শ্রেণিতে। এখান থেকে ১৮৮৭ সালে প্রথম শ্রেণির সরকারি স্কলারশিপ নিয়ে এনট্রান্স পাশ করেন। সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে তাঁর স্থান হয় ষষ্ঠ। ভর্তি হন রাজশাহি কলেজে। দুবছর পর ১৮৮৯ সালে ফার্স্ট আর্টস (এফ এ) পরীক্ষার কিছু আগে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। পরীক্ষার মাত্র তিনদিন আগে তাঁর জ্বর ছাড়ে। তবু এই পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণির সরকারি স্কলারশিপ পান এবং দশম স্থান অধিকার করেন।

বি এ পড়ার জন্য যদুনাথ ভর্তি হলেন কলকাতার সম্ভ্রান্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে। তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল ইডেন হিন্দু হোস্টেলে। সেখানে এই মেধাবী, মনোযোগী ছাত্রের রুমমেট হলেন শোভাবাজার ফুটবল দলের গোলকিপার সুরেশ চক্রবর্তী। এ-এক ভাল যোগাযোগ। যদুনাথের ম্যালেরিয়ায় ভোগা অশক্ত শরীর সুরেশের তত্ত্বাবধানে ব্যায়াম করে অনেকটা চাঙ্গা হল। তাছাড়া তাঁর মনে ফুটবল খেলার প্রতি এক স্থায়ী

আগ্রহও তৈরি হল। পরবর্তী অধ্যাপনার জীবনে ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার এক সেতু হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন এই বিদেশি খেলাটিকে, ছাত্রদের বহু ম্যাচে রেফারি হিসেবে নেমে পড়েছেন মাঠে। আবার হোস্টেল পত্রিকা 'সুহৃদ'-এর সূত্রে ঐতিহাসিক যদুনাথের যাত্রা শুরু। টিপু সুলতানের পতন বিষয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধটি নজর কেড়েছিল পত্রিকার দুই উপদেষ্টা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

১৮৯১ সালে যদুনাথ ইংরেজি সাহিত্য এবং ইতিহাসে ডবল অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করলেন। দুটি বিষয়েই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান পেলেন। অধ্যাপক পার্সিভাল সাহেব যদুনাথের ইংরেজি উত্তরপত্র পরীক্ষা করে এত মুগ্ধ হন যে তিনি তাঁর এই ছাত্রকে ইংরেজি নিয়ে এম. এ পড়ার পরামর্শ দেন। বিষয় হিসেবে ইতিহাসের প্রতি এক আলাদা দুর্বলতা থাকলেও যদুনাথ গুরুবাক্য শিরোধার্য করেন। সেই সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল তা নিশ্চিত বোঝা গেল রেজাল্ট বেরোনোর পর।

ইংরেজি এম এ-তে রেকর্ড নম্বর পেয়ে যদুনাথ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হলেন : গড়ে শতকরা নব্বই শতাংশ নম্বর। তাঁর আগে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর দে এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রেকর্ড নম্বর নিয়ে গণিতে এম এ পাশ করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্য বিষয়ে পরীক্ষায় যদুনাথের নম্বর তাঁদের কৃতিত্বকেও যেন ছাপিয়ে যায়। প্রথম তিন পত্রে তিনি যথাক্রমে ৯০, ৯২ এবং ৯৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। বিলাতে উচ্চশিক্ষার জন্য যদুনাথকে একটি সরকারি স্কলারশিপের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু সেটি না নিয়ে যদুনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে কঠিন এবং সবচেয়ে সম্মানজনক পরীক্ষা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। ইংরেজি সাহিত্য থেকে সরে এসে তিনি গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নেন ভারত ইতিহাসের এক অল্প আলোচিত সময়কালকে। ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বরে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি স্বর্ণপদক এবং দশ হাজার টাকা লাভ করেন। ১৯০১ সালে তাঁর গবেষণাপত্রটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় : India of Aurangzib : Topography, Statistics and Road।

কালানুক্রম রক্ষার স্বার্থে বলা দরকার, এই বৃত্তির জন্য প্রস্তুতির মাঝেই যদুনাথ অধ্যাপনার জীবনে প্রবেশ করেছেন—তাঁর ভাষায় 'মাস্টারি' বৃত্তি।

শিক্ষাব্রতী আচার্য

যদুনাথের এম এ পরীক্ষার রেকর্ড-ভাঙা ফলাফল সেসময় কলকাতার শিক্ষিত মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। প্রতিভার জহুরি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে যদুনাথকে আমন্ত্রণ জানান। ১৮৯৩ সালে যদুনাথ এখানে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন। মনে করিয়ে দিই, তখন তাঁর বয়স সাড়ে বাইশ।

ফলে কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণির দরজার সামনে প্রথম দিন দীর্ঘদেহী, ঋজু, গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই যুবকটি একটি বই হাতে কিঞ্চিৎ গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে দেখে করিডরে জটলা করা ছাত্ররা ভাবল, নিশ্চয় প্রথম বার্ষিক শ্রেণিতে সদ্য ভর্তি হওয়া নবাগত ছাত্র। ভুল ভাঙতে অবশ্য দেরি হল না। ঘণ্টা পড়তেই সেই যুবক শ্রেণিকক্ষের মঞ্চে উঠে শুরু করলেন তাঁর পাঠদান—যদুনাথের মাস্টারি জীবনের প্রথমদিনেই মাস্টার স্ট্রোক। ছাত্রেরা মুগ্ধ হয়ে গেল তাঁর পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায়। কিঞ্চিৎ সংশয়ী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথও, নতুন ছেলেটিকে প্রথমেই চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণির ক্লাস দেওয়া কি ঠিক হল? একটু পরেই তিনি

শ্রেণিকক্ষের বাইরে এসে চুপ করে দাঁড়ালেন এবং মুগ্ধ হলেন, আশ্বস্ত হলেন। যদুনাথ পরবর্তী জীবনে এই দিনটির স্মৃতিচারণ করে বলতেন, ''একজন শিক্ষকের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে তাঁর প্রথমদিনের লেকচারের ওপর, and I was successful।''

আচার্য যদুনাথের এই দাবি নিয়ে দ্বিমত নেই কোনও। প্রথম দিন থেকে শুরু করে তাঁর সুদীর্ঘ অধ্যাপক জীবনের সম্পূর্ণ সময়কাল জুড়েই তিনি চূড়ান্ত সফল। পণ্ডিত, মেধাবী পড়ুয়ারা অনেক সময় ভাল শিক্ষক হতে পারেন না। কিন্তু আচার্য যদুনাথ পেরেছিলেন। অধ্যাপনা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, পরিশ্রমী 'নোট', কৌতূহলী ছাত্রের মুক্তচিন্তাকে প্রশ্রয়—এই বৈশিষ্ট্যগুলিই অধ্যাপক যদুনাথকে ছাত্রমহলে একাধারে শ্রদ্ধেয় এবং জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তাছাড়া ছাত্রদের মান এবং গ্রহণ ক্ষমতা বিচার করে নিজের লেকচারকে সেই মতো ছাঁচে ফেলার এক বিরল ক্ষমতা ছিল তাঁর। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে তিনি সহজ, সরল এবং স্পষ্ট। আবার সেই একই বিষয় বি এ বা এম এ ক্লাসে পড়াতে গিয়ে তিনি গভীর, বিস্তারিত এবং বিশ্লেষণী।

রিপন কলেজে তিন বছর অধ্যাপনা করে যদুনাথ সরকার যোগ দেন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) ইংরেজি বিভাগে। এখানে কর্মরত অবস্থায় ইংরেজি সাহিত্যের এই অধ্যাপক তাঁর ইতিহাস চর্চার সূত্রে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ইংরেজিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে রেকর্ড নম্বর অর্জন, আর ইতিহাসে গবেষণার সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্তি—দুটি পৃথক বিষয়ে এমন দুই প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্গ জয় তাঁর অধ্যাপনার কেরিয়ারে এক প্রবল ইতিবাচক অনুঘটনের কাজ করে।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ১৮৯৮ সালের জুন মাসে তিনি অধ্যাপনার সরকারি চাকরি বা 'প্রভিন্সিয়াল এডুকেশনাল সার্ভিস'-এ নির্বাচিত হন। প্রথমে তাঁর পোস্টিং হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে, তারপর বছরখানেক পর পাটনা কলেজে। পাটনাই হয়ে ওঠে তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি। এখানে তিনি ইংরেজি ও ইতিহাস উভয় বিভাগেরই প্রধান অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। সেইসঙ্গে চলতে থাকে ঔরঙ্গজেব নিয়ে ব্যাপকতর গবেষণা। ১৯১২ সালে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণাগ্রন্থ 'History of Aurangzib' প্রথম দুই খণ্ড প্রকাশিত হলে আন্তর্জাতিক পণ্ডিত মহলে তিনি নজর কাড়েন।

তখন থেকে কথা ওঠে, এত সমাদৃত এক পণ্ডিতকে ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে (IES) উন্নীত করা হচ্ছে না কেন? অ্যানি বেসান্ত বিলাতে গিয়ে এই বিষয়ে প্রশাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শেষপর্যন্ত ১৯১৮ সালে IES হিসেবে অধ্যাপক যদুনাথকে বদলি করা হয় কটক র‍্যাভেনশ কলেজে ইতিহাস ও ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে। তাছাড়া তিনি স্বেচ্ছায় ঐচ্ছিক বাংলা বিষয়টি পড়ানোর দায়িত্বও নেন। এখানেও ছাত্রমহলে তিনি বিপুল সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। চাকরি জীবনের শেষপর্বে ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে আবার ফিরে আসেন পাটনা কলেজে। এই প্রসঙ্গে যদুনাথের মন্তব্য, ''বিহারের কাছে আমার ঋণ বড় কম নয়, ছয় বছর বাদ দিয়ে আমার সমগ্র কর্মজীবন এই প্রদেশেই অতিবাহিত হয়েছে। পাটনাকে আমি আমার আধ্যাত্মিক জন্মভূমি বলে দাবি করতে পারি। এইখানেই আমি আমার গবেষণা কাজের জন্য যেমন সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি ভারতের অন্যত্র তা দুর্লভ ছিল। ভারতের অতীত ইতিহাস আমি তার উৎসক্ষেত্রেই অনুশীলন করেছি...।''

১৯২৬ সালে অধ্যাপক যদুনাথ তাঁর শিক্ষকতার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পাটনা

কলেজের সেইসময়ের এক ছাত্র স্মৃতিচারণ করেছেন, কাজের শেষ দিনেও তাঁদের আচার্য কেমন ঠিক সময়ে কলেজে এসেছিলেন এবং রুটিনমাফিক সেদিনের নির্দিষ্ট সব কটি ক্লাস নিয়েছিলেন। তার আগেই অবশ্য তিনি জেনে গেছেন, বাংলার গভর্নর তথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত করেছেন। এই নিয়োগের কিঞ্চিৎ বিতর্কিত এক প্রেক্ষাপট আছে।

উপাচার্য হিসেবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব এবং যোগ্যতা প্রশ্নাতীত হলেও তাঁর কার্যকালের শেষের দিকে কর্তৃত্বের রাশ অনেকটা শিথিল হয়ে আসে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় ১৯১৭ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে যদুনাথ ছয়টি প্রবন্ধ লেখেন। তার মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁর আপত্তির কথা ছিল; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের বিষয়ে তাঁর পরামর্শ ছিল; দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সিদ্ধান্ত ঘোষণা ছিল : শিক্ষামন্দিরে একজনের (অর্থাৎ স্যার আশুতোষের) নেতৃত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে ভবিষ্যতে তা নানা বিশৃঙ্খলার কারণ হতে পারে। স্পষ্টতই তাঁর এইসব মতামত শিক্ষামহলে সকলের পক্ষে সহজপাচ্য হয়নি। তাই উপাচার্য হিসেবে তাঁর নিয়োগকেও সবাই স্বাগত জানাননি। বিশেষত সিনেট-সিন্ডিকেটে তাঁর সমর্থক প্রায় কেউ ছিলেন না। ফলে, নিজে আন্তরিক পরিশ্রম করলেও এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মূল সমস্যার কারণগুলি চিহ্নিত করতে পারলেও বাস্তবে তার চিকিৎসা প্রয়োগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই তাঁর উপাচার্যের কার্যকাল (১৯২৬—১৯২৮) নিরপেক্ষ বিচারে ব্যর্থ হিসেবেই ধরতে হবে।

অথচ প্রশাসক হিসেবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এই মানুষটিই তাঁর আশ্চর্য দূরদৃষ্টি ও স্বকীয়তার ছাপ রেখে গেছেন। ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে তাঁর নেতৃত্বে পরিষদে নতুন প্রাণসঞ্চার হয়। প্রবীণদের মধ্যে তাঁর সমসাময়িক মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বয়ঃকনিষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে এই কাজে প্রভূত সাহায্য করেন। অধ্যাপক সরকার ১৩৪২—৪৩, ১৩৪৭—৫১ এবং ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

জ্ঞানচর্চার জগতে প্রশাসক হিসেবে আচার্য যদুনাথের আর এক কীর্তি 'ইন্ডিয়ান হিস্টরিকাল রেকর্ডস্ কমিশন'। ১৯১৯ সালে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করে ১৯৪১ অবধি তিনি সক্রিয়ভাবে এই সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নানা সংস্থা, রাজন্যবর্গ, সাধারণ মানুষের কাছে ছড়িয়ে থাকা বিরল নথি ও পুঁথি সংগ্রহ করে এই কমিশন আমাদের দেশীয় ইতিহাস সন্ধানে এক চিরস্থায়ী কাজ করে গেছে। আর যেন এক ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা থেকে ঐতিহাসিক যদুনাথ এই সংস্থার হয়ে গোটা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন অমূল্য রতনের খোঁজে।

ঐতিহাসিক

হ্যাঁ, ঐতিহাসিক। যদি একটিমাত্র শব্দে অধ্যাপক যদুনাথের পরিচয় দিতে হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে 'ঐতিহাসিক' অভিধাটিই বেছে নিতে হবে। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির সূত্রে তিনি মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে নিয়ে যে-উচ্চপ্রশংসিত প্রাথমিক গবেষণাটি করেন, দশক-ব্যাপী গভীর অধ্যবসায় ও আন্তরিক অনুসন্ধিৎসায় সেই গবেষণাটিকেই তিনি সম্পূর্ণ রূপ দেন। কিন্তু সেই বিষয়ে প্রবেশ করার আগে ভারত ইতিহাসের ঠিক এই পর্বটিকেই তিনি কেন বেছে নিলেন সেটা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি।

এই প্রসঙ্গে যদুনাথের গবেষক-ছাত্র ও পরবর্তী কালের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ড. কালিকারঞ্জন কানুনগোর যুক্তিটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়। ''ওই সময়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বৃদ্ধ ভাণ্ডারকরের কৃতিত্ব মধ্যন্দিন রেখায় পৌঁছিয়াছে, প্রাচীন ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণতর এবং উদীয়মান গবেষকগণের ভিড়ও বেশি।... 'নূতন কিছু' পাওয়ার সম্ভাবনা প্রাচীন ভারত অপেক্ষা মুসলমান ইতিহাসে বেশি; একটা তাম্রশাসন একটি মুদ্রা কিংবা পুঁথি পাওয়া গেলে প্রাচীন ভারতের ময়দানে কাড়াকাড়ি পড়ে, লড়াই শুরু হয়। হরিলুটের বাতাসায় সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যক্তি যদুনাথ ছিলেন না; তাঁহার প্রতিভা, উদ্যম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্ভবত নাদিরশাহী লুঠের আশায় ময়ূর সিংহাসনকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছিল।''[১] শোনা যায়, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য যদুনাথ প্রাথমিকভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনাকাল নিয়ে কাজ করবেন মনস্থ করেন, কিন্তু এই বিষয়ে বেভারিজের মূল্যবান গবেষণা প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি ঔরঙ্গজেবে মনোনিবেশ করেন।

১৯১২ সালে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ আন্তর্জাতিক বিদ্বৎসমাজে দুই প্রতিভাধর বাঙালিকে সশ্রদ্ধ প্রতিষ্ঠা এনে দেয়: একটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি'-র ইংরেজি অনুবাদ আর অপরটি যদুনাথ সরকারের 'History of Aurangzib' গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ড। উইলিয়াম আর্ভিন-সহ দেশ-বিদেশের পণ্ডিতেরা আচার্য যদুনাথকে এক প্রথম শ্রেণির ঐতিহাসিক হিসেবে স্বাগত জানালেন। আশ্বস্ত যদুনাথ আরও প্রায় এক যুগ ধরে এই বিষয়ের গবেষণায় নিবিষ্ট থাকলেন। শেষপর্যন্ত ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হল এই অমূল্য গবেষণাগ্রন্থের পঞ্চম তথা সর্বশেষ খণ্ড। শাহজাহানের রাজত্বকালের শুরুর দিক থেকে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুশয্যায় মুঘল-মহিমার সূর্যাস্ত অবধি এই অনুপুঙ্খ গবেষণার সময়কাল।

ঔরঙ্গজেব ও তাঁর সময়কাল নিয়ে গবেষণা করতে করতেই তাঁর প্রবল বিরোধী মারাঠা নায়ক ছত্রপতি শিবাজির বিষয়ে যদুনাথ আগ্রহী হন। তাঁকে নিয়ে তথ্যসংগ্রহও তিনি সমান নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে যান। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় শিবাজি সংক্রান্ত তাঁর মৌলিক গবেষণাগ্রন্থ 'Shivaji and His Times'। পরবর্তী তেত্রিশ বছরে বইটির মোট পাঁচটি সংস্করণ হয়। অক্লান্ত যদুনাথ প্রতি সংস্করণেই নতুন নতুন তথ্য ও উপাদান তাতে যুক্ত করেন। বিশেষত পঞ্চম সংস্করণে (১৯৫২) বইটির আমূল পরিবর্তন ঘটে। ঐতিহাসিকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে যুযুধান দুই বীরকে নিয়ে সমান আগ্রহ ও শ্রদ্ধায় চর্চা চালিয়ে গেছেন যদুনাথ। তাঁর উপলব্ধি, ''শিবাজীর চরিতকথা আলোচনা করিয়া আমরা এই শিক্ষা পাই যে, প্রয়াগের অক্ষয়বটের মতো হিন্দুজাতির প্রাণ মৃত্যুহীন। কত শত বৎসরের বাধা-বিপত্তির ভার ঠেলিয়া ফেলিয়া আবার মাথা তুলিবার, আবার নূতন শাখাপল্লব বিস্তার করিবার শক্তি তাহাদের মধ্যে নিহিত আছে।''

ইংরেজি-অনভ্যস্ত বাঙালি পাঠকের সঙ্গে এই মারাঠা বীরের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য অধ্যাপক সরকার বাংলায় 'শিবাজী' নামে একটি বই (১৯২৯) লেখেন। উপরের উদ্ধৃতিটি সেখান থেকেই। আপশোস হয়, ঔরঙ্গজেবকে নিয়ে তাঁর সুবৃহৎ ইংরেজি গবেষণার এক সংক্ষিপ্ত এক খণ্ডের সংস্করণ (১৯৩০) প্রকাশ করলেও এবং তার একটি হিন্দি অনুবাদ প্রকাশে সায় দিলেও যদুনাথ এমন কোনও বাংলা গ্রন্থরচনায় উদ্যোগী হননি। বস্তুত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে তিনি বহু চিন্তাগর্ভ নিবন্ধ লিখলেও সেগুলি গ্রন্থভুক্ত করার বিষয়েও তিনি আশ্চর্য নির্লিপ্ত ছিলেন। তাঁর বাংলা 'রচনা সম্ভার' সংকলনটির (এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স

প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১) সম্পাদকদ্বয় নিখিলেশ গুহ এবং রাজনারায়ণ পাল তাঁদের 'নিবেদন' শুরুই করেছেন সেই আক্ষেপের কথা জানিয়ে : ''আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসাবে যদুনাথ সরকারের আন্তর্জাতিক খ্যাতির মূলে রয়েছে ইংরেজি ভাষায় রচিত তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ। কিন্তু মাতৃভাষায় তাঁর লেখনী যে সমান সচল ছিল, এ-কথা কজন মনে রেখেছেন? মানছি এজন্য যদুনাথকেও কিছুটা দায়ী করা যেতে পারে। তিনি নিজে বাংলাভাষায় রচিত তাঁর প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী রূপ দিতে উদ্যোগী হননি। ফলে জলমগ্ন শৈলখণ্ডের ঊর্ধ্বভাগের মতো তাঁর বাংলা রচনার মধ্যে কেবলমাত্র শিবাজীর একটি জীবনালেখ্য আজ আমাদের চোখে পড়ে।''

ঔরঙ্গজেব এবং শিবাজী নিয়ে গবেষণার পর তাঁর চর্চার বিষয় ছিল 'ফল অফ দি মুঘল এম্পায়ার'। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হল তার প্রথম খণ্ড। অভিজ্ঞ পাঠক বুঝতে পারলেন গিবন রচিত ক্লাসিক 'ফল অফ দি রোমান এম্পায়ার'-এর মতোই উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক প্রকল্পে হাত দিয়েছেন আচার্য যদুনাথ। কিন্তু তাঁর পথ গিবনের চেয়েও কণ্টকাকীর্ণ। গিবন এই বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরি কিছু ঐতিহাসিকের কাজ ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু যদুনাথ যখন মুঘল সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে তাঁর চর্চা শুরু করলেন তখন এটি প্রায় অকর্ষিত এক ঊষর জমি। বিষয়টি সামগ্রিকভাবে ধরতে অক্লান্তকর্মা গবেষক যদুনাথ প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর আরও আঠারো বছর সময় নিলেন। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হল বইটির চতুর্থ বা শেষ খণ্ড।

কাজ শেষ করে মহারাষ্ট্র ইতিহাস বিশেষজ্ঞ তথা বন্ধু গোবিন্দ সখারাম সরদেশাইকে যদুনাথ ১৫ মে ১৯৫০ চিঠিতে লিখলেন, ''আমি বলতে পারি যে, মসি দিয়ে নয়, আমার বুকের রক্ত দিয়েই রচনা করেছি এই ইতিহাস।'' বাস্তবিক, অধ্যাপক সরকারের সব কটি গবেষণাগ্রন্থ সম্পর্কেই তিনি এই দাবি করতে পারেন—তাঁর শরীর এবং মেধা নিঙড়ে নেওয়া এইসব অন্বেষণ। এর মধ্যে কোনটিকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিতে হবে বাছতে গেলে বসে যাবে জমজমাট বিতর্কসভা। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে ঐতিহাসিক যদুনাথের কোথায় শ্রেষ্ঠত্ব এবং মৌলিকত্ব সেটি বুঝতে চাইলে তাঁর গবেষণার কিছু অবধারিত বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে হবে।

প্রথমত তাঁর স্বাবলম্বী চরিত্র। প্রাচ্যের ইতিহাস রচনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার প্রচলিত পথ ছেড়ে তিনি নিজস্ব পথ খুঁজে নেওয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন। নিজেদের দেশে ছড়িয়ে থাকা নানা দলিল, নথি ও অন্যান্য উপকরণ সন্ধান করে, তার পাঠোদ্ধার ও বিশ্লেষণ করে তিনি ভারতবর্ষের নিজস্ব ইতিহাস রচনা করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার পরামর্শ যদুনাথ চিরকাল মনে

রেখেছিলেন : ''বিদেশীদের সামনে নিজের পতাকা কখনও নিচু করবেন না। নিজের জন্য গবেষণার যে শাখাটিকে বেছে নিয়েছেন, চেষ্টা করুন তাতে যেন আপনিই সবচেয়ে প্রামাণ্য ব্যক্তি হন, সেখানে যেন ভারতবর্ষ সেরার স্বীকৃতি পায়।''

এই ব্রতে অবিচল থাকতে তাঁকে পরিশ্রম করতে হয় বিস্তর। তিনি নিজে তাঁর শেষ জীবনে স্মৃতিচারণ করেছেন এক রেডিও কথিকায় : ''...কোনো একজন দিল্লীর বাদশা অথবা মারাঠা রাজার ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমাকে প্রথমে দশ বছর ধরে তার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে; সেগুলি সাজিয়ে, সংশোধন করে, আলোচনা করে, মনের মধ্যে হজম করে, দশ বৎসর পরে ঐ পুস্তকের লেখা আরম্ভ করি, তার আগে নয়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুষ্প্রাপ্য পুস্তক কিনতে ও ফার্সী হস্তলিপির নকল নিতে বোধ হয় আমার উদ্বৃত্ত আয়ের অর্দ্ধেক খরচ হয়েছে; মারাঠা দেশে ত্রিশ-বত্রিশ বার এবং আগ্রা, দিল্লী, মালয়, রাজপুতানা প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রদেশে বারো-তেরো বার বেড়িয়েছি।''[২]

আচার্যের জীবনীকার মণি বাগচি বিষয়টি আরও স্পষ্ট করেছেন : ''যদুনাথের রচিত ইতিহাস মানেই শুধু ইতিবৃত্ত বা কাহিনী নয়, তার অতিরিক্ত অনেক কিছু। তাঁর এইগুলির মধ্যে আমরা যুগপৎ পাই স্থানের বিবরণ (Topography), পরিসংখ্যান, জীবনী, ইতিহাস, শাসনপদ্ধতি, অর্থনীতি, সামরিক ইতিহাস, যুদ্ধের বর্ণনা—সব কিছু। আরও একটা জিনিস পাই—ইতিহাসের তাৎপর্য। এইজন্যই তাঁকে বলা হয়েছে Complete Historian বা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-সাধক।... তিনি সব সময়েই মূলের অনুসন্ধান করতেন এবং যেখানেই পেতেন সেখান থেকেই মৌলিক উপকরণ সংগ্রহ করতেন। এবং এজন্য অর্থব্যয়ে তিনি কিছুমাত্র কার্পণ্য করতেন না।''[৩]

কিন্তু শুধু অর্থব্যয় করলেই হবে না, সেইসব মূল উপকরণের মধ্যে রয়েছে ফারসি পাণ্ডুলিপি, চিঠি, রাজস্থানি ডেসপ্যাচ, মারাঠি বখার, ফরাসি স্মৃতিকথা ও জার্নাল, পর্তুগিজ নথি, ওলন্দাজীয় রেকর্ড—সুতরাং এসব থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করতে গেলে মেধা ও বোধের সঙ্গে সঙ্গে তো দরকার সংশ্লিষ্ট ভাষার জ্ঞান। ইতিহাস রচনার তাগিদে অধ্যাপক সরকারকে তাই বহুভাষাবিদ হতে হয়েছিল। তিনি উত্তমরূপে শিখেছিলেন ফরাসি, পর্তুগিজ, ফারসি, আরবি, সংস্কৃত, মারাঠি, রাজস্থানি এবং গুরুমুখী। এই ভাষাজ্ঞানের কল্যাণেই তিনি কিছু মূল্যবান গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন : চৈতন্যচরিতামৃত, ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক হামিদ্‌উদ্দিন খাঁ রচিত ফারসি গ্রন্থ 'আহ্‌খম্‌-ই-আলমগিরি', মুস্তামি খাঁ রচিত 'মাসির-ই-আলমগিরি', ভীমসেন রচিত 'নুশ্‌খা-ই দিলকশা', ইত্যাদি। সম্পাদনা করেন Persian Records of Maratta History, Volume I।

যদুনাথের রচনার আকর্ষণ তার সরসতা বা প্রসাদগুণ। ইংরেজি সাহিত্যের এই মেধাবী অধ্যাপক এবং বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের এই নিবিষ্ট পাঠক তাঁর ইতিহাস রচনাকে কখনই শুকনো তথ্যের তালিকা বানাতে চাননি। ফলে তাঁর পরিশ্রমলব্ধ গবেষণাগ্রন্থগুলি সুখপাঠ্যও বটে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির ভূমিকা লিখতে গিয়ে যদুনাথ ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

ঐতিহাসিক যদুনাথের পাঠক অবাক হয়ে যান তাঁর নৈর্ব্যক্তিকতা দেখে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে এত দীর্ঘকাল ধরে সম্পৃক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি বিচার-বিবেচনায় সম্পূর্ণত নিরপেক্ষ থাকতে পারতেন। তাঁর গবেষক-ছাত্র কালিকারঞ্জন কানুনগো জানিয়েছেন এই ব্যাপারে তাঁদের আচার্য কতটা সচেতন থাকতেন : ''তিনি সর্বদাই বলতেন,

গবেষণার কাজে লিপ্ত হওয়ার পর গবেষকদের মনের মধ্যে যেন কোনওরকম রাজনৈতিক পক্ষপাত না থাকে অথবা সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা থেকে তাদের মন যেন মুক্ত, শুদ্ধ থাকে। রাজনৈতিক পক্ষপাতের প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকা গবেষকদের প্রথম কর্তব্য। তাঁর আর একটি উপদেশ এই ছিল যে, সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধ করা নয়, সত্যই হল প্রকৃত গবেষণার লক্ষ্য।"[৪]

১৯১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণে যদুনাথ এই বিষয়ে আরও দ্ব্যর্থহীন : ''সত্য প্রিয় কি অপ্রিয়, অথবা তা প্রচলিত মতের বিরোধী কি অবিরোধী তা আমি গ্রাহ্য করি না। দেশের প্রাচীন গৌরবকে তা আঘাত করবে কি করবে না, তাও আমি বিবেচনার মধ্যে আনব না। প্রয়োজন হলে সত্য প্রচার করতে গিয়ে আমি বন্ধুজনের ও সমাজের উপহাস বা অপবাদ ধৈর্যের সঙ্গেই বহন করব। কিন্তু তথাপি আমি সত্যকেই অন্বেষণ করব, সত্যকেই উপলব্ধি করব এবং সত্যকেই গ্রহণ করব। প্রত্যেক ঐতিহাসিকের এটাই সুদৃঢ় সংকল্প হওয়া উচিত।"

বর্তমান ইতিহাসচর্চার ধারা অনেকটাই পরিবর্তিত। কিন্তু তবু যদুনাথের এই পক্ষপাতহীন সত্যবদ্ধতা তাঁকে এখনও প্রাসঙ্গিক এবং সর্বজনমান্য ঐতিহাসিকের মর্যাদা দিয়ে চলেছে।

নিঃসঙ্গ পথিক

সত্যের প্রতি এই নিঃশর্ত আনুগত্য এবং অপ্রিয় সত্য প্রকাশে তাঁর কুণ্ঠাহীনতা যদুনাথকে জীবনপথে বরাবর বড় নিঃসঙ্গ করে রেখেছিল।

উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করতে পারি। উভয়ের মধ্যেই পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক। ভগিনী নিবেদিতার আহ্বানে কয়েক দিনের জন্য বুদ্ধগয়া বেড়াতে গিয়ে যদুনাথ-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরও আন্তরিক হয়। অবাঙালি পাঠকের কাছে রবীন্দ্রসাহিত্য পৌঁছে দেওয়ার আকুতিতে ১৯১০—১৩ যদুনাথ তাঁর আর এক বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্প এবং চোদ্দোটি প্রবন্ধ অনুবাদ করেন। এইসময় 'সোনার তরী' কবিতার ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে কবির মতান্তরে যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কলম ধরেন, 'প্রবাসী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩১৩ সংখ্যায় তাঁর '' 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা'' প্রকাশিত হয়। গুণমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ ১৯১৭ সালে তাঁর 'অচলায়তন' নাট্য অধ্যাপক যদুনাথকে উৎসর্গ করেন। এই বাতাবরণে রবীন্দ্রনাথ কটকের র‍্যাভেনশ কলেজের অধ্যাপক যদুনাথকে বিশ্বভারতী পরিচালন সমিতির সভ্য হওয়ার অনুরোধ জানান। প্রস্তাবটি এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে অন্য কাজের ব্যস্ততা বা দূরে অবস্থানের যুক্তি দিলেই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তাঁর অপারগতা জানানোর পত্রে যদুনাথ স্বতঃপ্রণোদিত-ভাবে নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ত্রুটির কথা সবিস্তারে লিখে জানান। আহত রবীন্দ্রনাথ উত্তরে লেখেন, ''আমার কর্মের প্রতি আপনার এমন অবজ্ঞা মিশ্রিত অশ্রদ্ধার তীব্রতায় আমি নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছি।"

সামাজিক মেলামেশায় সৌজন্যের অনিবার্য মুখোশ ব্যবহারে এই অনীহা বারবার মানুষ যদুনাথকে বুঝতে বাধার সৃষ্টি করেছে। অনেকে ভেবেছেন তিনি উদ্ধত, অবিনয়ী, অহংকারী। কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্ররা ঠিক বিপরীত সাক্ষ্য দিয়েছেন। পাটনায় তাঁর ভিখনাপাহাড়ির বাড়িতে ছিল দুই মহল। বাইরের মহলে তাঁর গ্রন্থাগার এবং কয়েকজন গবেষক ছাত্রের থাকার কক্ষ। প্রতিশ্রুতিবান ছাত্রদের তিনি সম্পূর্ণ নিজের খরচে সেখানে রাখতেন, 'গুরুজী'-র (যে-নামে ছাত্ররা তাঁকে সশ্রদ্ধায় সম্বোধন করতেন) গ্রন্থাগারে ও রান্নাঘরে তাঁর

পুত্রকন্যাদের সঙ্গে তাঁদেরও ছিল অবাধ অধিকার। আচার্যপত্নী কাদম্বিনী দেবী ছিলেন তাঁদের মায়ের সমান। এইভাবে সেখানে গবেষণা করেছেন 'শেরশাহ' বিশেষজ্ঞ কালিকারঞ্জন কানুনগো, কে কে বসু, এস সি সেনগুপ্ত, পি সি রায়চৌধুরী প্রমুখ ভবিষ্যতের কৃতবিদ্য ঐতিহাসিকেরা। শুধু পাটনা নয়, কটক-কলকাতা-দার্জিলিং তাঁর সব বাড়িই গবেষক-ছাত্রদের জন্য অবারিতদ্বার। অথচ এই বিষয়ে বাইরের খুব কম মানুষই জানতে পারতেন।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হরিরাম গুপ্তের ডক্টরেট থিসিসের অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন অধ্যাপক যদুনাথ। গবেষণাপত্রটি তাঁর খুব পছন্দ হওয়ায় লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তিনি এটি মুদ্রণের সুপারিশ পাঠান। কিন্তু কর্তৃপক্ষের তরফে তেমন ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে যদুনাথ নিজ ব্যয়ে ও দায়িত্বে এটি কলকাতায় ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। এমনকী শত ব্যস্ততার মাঝে প্রুফ সংশোধনও নিজেই করেন। তারপর মুদ্রিত পুস্তক লাহোরে হরিরামের কাছে পাঠিয়ে দেন। পরে লেখকের অনেক অনুরোধে শেষপর্যন্ত কাগজ ও বাঁধাইয়ের দামটুকু নিতে সম্মত হন।

খুব অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ছিল যদুনাথের। স্বদেশি আন্দোলন শুরুর আগে থেকেই স্বাজাত্যাভিমানী যদুনাথ বিদেশি মিলের ধুতি ব্যবহার করতেন না। আমেদাবাদে এক দেশি মিলের খোঁজ করে সেখানকার ধুতি ব্যবহার করতেন। তাঁর গবেষক-ছাত্র, 'বাঙ্গালীর ইতিবাস' প্রণেতা নীহাররঞ্জন রায় আচার্যের জীবনীগ্রন্থের ভূমিকায় মানুষ যদুনাথের এক আন্তরিক ছবি এঁকেছেন : ''ঐতিহাসিক যদুনাথ, পণ্ডিত যদুনাথ, মনীষী যদুনাথ কিছুটা দূরের মানুষ যিনি বিদ্বজ্জনের শ্রদ্ধার পাত্র, ঐতিহাসিক গবেষণায় জ্যেষ্ঠাগ্রজ হিসাবে যিনি নমস্য, যাঁর রচিত গ্রন্থাদি আরও বহু বৎসর অধীত হবে, সযত্নে ও সাগ্রহে। কিন্তু, আর এক যদুনাথ ছিলেন যাঁকে আমি জেনেছিলাম,—যিনি চলনে বলনে অশনে বসনে ছিলেন একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী, যিনি শ্রীমানী-মার্কেটে বাজার করে বাজারের থলে হাতে নিয়ে সুকিয়া স্ট্রীট ধরে হেঁটে হেঁটে বাদুড় বাগানের বাড়িতে ফিরতেন—তখন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য...।... যিনি কখনও বিদেশী পণ্ডিতসমাজের মতামতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেননি, যিনি ছিলেন মনেপ্রাণে স্বদেশী। অথচ সেই যদুনাথই নিয়মানুবর্তিতায়, সময়নিষ্ঠায়, স্পষ্টভাষণে, চরিত্রের দার্ঢ্যে, ব্যক্তিত্বের গরিমায় ছিলেন একান্তই উনিশ শতকীয় ইংরাজ। বিস্মিত হই ভেবে যে, এই ইংরাজ যদুনাথেরই চিত্তের গভীরে নেহাতই বাঙ্গালীসুলভ একটি স্নেহের নীড় বিরাজ করতো...।''

এই বর্ণনা পড়ে মনে পড়ে আমাদের নবজাগরণের এক প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা। তাঁর সঙ্গে যদুনাথের ব্যক্তিত্বের যেন এক অন্তর্লীন মিল। যদুনাথ নিজেও সেকথা বলতেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন কলকাতার ছাত্রাবস্থায় 'সংস্কৃত যন্ত্র প্রেস' নামের পুস্তকালয়ে কেমন ঈশ্বরচন্দ্রকে একবার দর্শন করেছিলেন। ভুলে যাননি, তাঁর বি এ পাশের বছরে, ১৮৯১ সালে মৃত্যু হয় বিদ্যাসাগরের।

বিদ্যাসাগরের মতোই যদুনাথের নিয়মানুবর্তিতা এবং সময়ের মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা হয়তো কিঞ্চিৎ অতিরিক্তই। তাই তাঁর দর্শনার্থী মানুষ অনেক সময় অপ্রতিভ হতেন। তিনি এমন ভঙ্গিতে আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলতেন যে আগন্তুক অনুভব করতেন প্রয়োজনীয় কথাটুকু শেষ হওয়ার পর আর মুহূর্তমাত্রও তাঁর সামনে থাকা অভিপ্রেত নয়। বিশ্রম্ভালাপীর প্রতি যদুনাথের ঘোরতর অরুচি এবং তাদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশেও যদুনাথের আপত্তি। তাই এই জ্ঞানতপস্বী তথা কর্মযোগী সর্বদাই

নিঃসঙ্গ, নিজস্ব চর্চার জগতে একাকী পথিক। তাতেই তিনি আনন্দিত, তৃপ্ত।

কিন্তু দীর্ঘজীবী এই মানুষটি জীবনের শেষ দেড় দশকে একে একে যেভাবে সঙ্গীহীন হলেন তেমন নিঃসঙ্গতা নিশ্চয় তাঁর কাম্য ছিল না। ১৯৪২ সালে তাঁর তৃতীয় জামাতা, ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর সুশীল ঘোষ সিঙ্গাপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। ১৯৪৭-এর জানুয়ারিতে তাঁর বড় জামাতা, রাজশাহীর কৃতবিদ্য চিকিৎসক সৌরীন্দ্রনাথ সরকার ক্যানসারে মারা যান। তার চার মাস পর কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অতর্কিতে আহত হয়ে মারা গেলেন জ্যেষ্ঠপুত্র অবনীনাথ। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে যদুনাথ হায়দ্রাবাদে গেছেন নিজামের দপ্তরে সংরক্ষিত বহু ঐতিহাসিক দলিল পরীক্ষা করতে। একদিন প্রভাতী সংবাদপত্রে দেখলেন, প্রতিভাময়ী গবেষিকা রমা সরকার লন্ডনে আত্মহত্যা করেছেন—আচার্যের কনিষ্ঠা কন্যা। ছয় বছর পরে ১৯৫৫-য় দীর্ঘ রোগভোগের পর মারা গেলেন যদুনাথের কনিষ্ঠ পুত্র সত্যেন। ওই বছরই হঠাৎ পা পিছলে পড়লে চিরজীবনের জন্য পঙ্গু ও অকর্মণ্য হয়ে যান স্ত্রী কাদম্বিনী। এর দুবছর পর পুণায় মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যান যদুনাথের দ্বিতীয় নাতি ক্যাপ্টেন অমিতকুমার।

একের পর এক শোকের মুখে দাঁড়িয়েও যদুনাথ অবিচল, গবেষণাকর্মে একনিষ্ঠ। কিন্তু সংসারের কর্তব্য থেকেও তিনি পালিয়ে যাননি। বিধবা কন্যা ও পুত্রবধূর দায়িত্ব নিয়েছেন। দুই পৌত্র এবং তিন দৌহিত্রকে মানুষ করেছেন। জ্যেষ্ঠ পৌত্রের বিয়ের ব্যবস্থাও করেন। কনিষ্ঠ পুত্র সত্যেনের মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ''আমি সংসারে নিতান্ত একক। আমার সুখ-দুঃখের ভাগিদার কেহ নাই। আমি self-pity করিতে চাহি না বা কাহারও সহানুভূতি চাহি না।'' শেষজীবনে নিজের জন্য তাঁর প্রার্থনা ছিল দুটি : এক, তাঁর যেন এমন অতর্কিত মৃত্যু হয় যাতে কাউকে তাঁর পরিচর্যা করতে না হয়, আর দুই, তাঁর আগে যেন তাঁর শয্যাশায়ী স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। শেষপর্যন্ত প্রথম প্রার্থনাটিই শুধু পূরণ হয়েছিল।

শিষ্য কালিকারঞ্জন কানুনগো তাঁর আচার্যের এক গোপন কথা গোচরে এনেছেন, ''জীবন-মৃত্যুর খেলায় যদুনাথের চোখে কেহ জল দেখে নাই, শুনিয়াছে মৃতের সৎকারের জন্য অকম্পিত কণ্ঠে সেই আলমগীরশাহী হুকুম। এ হেন ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করাও বিপজ্জনক ছিল। আসলে কিন্তু সুলতান বলবানের মতো গুরুজী মার খাইয়া মার চুরি করিতেন। এই রহস্য তাঁহার পড়ার ঘর গুছাইবার সময় টের পাইয়াছি। যেখানে কাহারো হাত পড়িবার সম্ভাবনা নাই সেইখানে তাঁহার প্রত্যেক মৃত সন্তানের ছবি চিঠিপত্র তিনি লুকাইয়া রাখিতেন, সম্ভবত রাত্রে তিনি ঐগুলি দেখিয়া প্রাণের হাহাকার মিটাইতেন, দিনের বেলায় অন্য মূর্তি—মেঘমুক্ত কর্মচঞ্চল সুলতানী মেজাজ, কোথাও কোমলতার চিহ্ন নাই।''[৫]

কোন মন্ত্রে নিজের কান্নাকে এমন আড়াল করে রাখতে পারতেন এই জ্ঞানযোগী? কিছুটা পরোক্ষে এর উত্তর দিয়ে গেছেন যদুনাথ। ন্যায়পরায়ণ, প্রজাবৎসল, প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট শাহজাহানের শেষজীবন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে যেন তাঁর নিজের শেষজীবনের প্রতিচ্ছবি, ''এই কি পুরস্কার? এই কি পুরুষকারের চরম ফল? বাস্তব জগতের চেয়ে আধ্যাত্মিক জগৎ প্রবলতর, মহত্তর, অধিকতর স্থায়ী আর এটাই আমাদের সান্ত্বনা।'' ধর্মাচরণের আনুষ্ঠানিকতায় তাঁর আগ্রহ ছিল না, কিন্তু যদুনাথ ঈশ্বর-বিশ্বাসে ছিলেন অবিচল। সেখানেই তাঁর আশ্রয়, তাঁর শুশ্রূষা। তিনি শেষজীবনে প্রতিদিন গুনগুন করে গাইতেন তিনটি গান : এক, তুমি হে ভরসা মম অকুল পাথারে; দুই, সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে; তিন, তোমারেই

করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি ছিল তাঁর সশ্রদ্ধ ভরসা। তাঁর সম্মতিতেই তাঁর তৃতীয় কন্যা অকালবিধবা সুধা বেলুড় মঠে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

পরলোকে গমনের কয়েক মাস আগে যদুনাথ লিখেছিলেন, ''দেশের প্রকৃত সন্তান কখনো তাঁর কর্মকৃতির ফল আহরণের চেষ্টা করেন না। তিনি যে তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন করতে পেরেছেন, এই বোধই তাঁর শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা, প্রায়শ তাঁর একমাত্র পুরস্কার।'' ঐতিহাসিক যদুনাথের জীবনে অবশ্য পুরস্কার বা স্বীকৃতির কোনও অভাব হয়নি। কিন্তু সেসবের প্রতি তাঁর নির্লিপ্তি ছিল তপস্বিসুলভ। ১৯২৬ সালে তিনি সি আই ই এবং ১৯২৯ সালে 'নাইটহুড' লাভ করেন। তারপরই একের পর এক দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্যার যদুনাথকে সম্মানিত করতে উদ্যোগী হয়। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৩৯ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট উপাধি প্রদান করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনুরূপ সম্মান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন; কিন্তু সেনেটের একজন সদস্য এই সিদ্ধান্তে প্রাথমিকভাবে দ্বিমত জ্ঞাপন করেন, যদিও বাকি সকলের সমর্থন থাকায় প্রস্তাব পাশে কোনও অসুবিধা হয় না। প্রখর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন যদুনাথ ঐকমত্যের অভাবের কথা জানতে পেরে এই সম্মান গ্রহণে তাঁর অপারগতার কথা জানিয়ে দেন। এরপর আরও বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা অনুরূপ প্রস্তাব তিনি একের পর এক ফিরিয়ে দেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে যখন সর্বোচ্চ নাগরিক খেতাব দেওয়ার প্রথা চালু হয় তখন, শোনা যায়, শিক্ষা দপ্তরের সচিব হুমায়ুন কবীর 'ভারতরত্ন' উপাধির জন্য আচার্য যদুনাথের নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁকে 'পদ্মভূষণ' দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। যদুনাথ এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন।

বরং তাঁর নিজের প্রিয় সারস্বত সংস্থা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রদত্ত সংবর্ধনা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। উপলক্ষ্য ছিল আচার্যের উনআশি বছর পূর্তি। ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত সেই সভার মানপত্রে উচ্চারিত বাণী আচার্য যদুনাথকে স্বীকৃতি জানাতে আজও সমান প্রাসঙ্গিক : ''তুমি পরাধীন ভারতবর্ষের কলঙ্কিত ইতিহাস মন্থন করিয়া স্বাধীনতার গৌরবরত্ন আহরণপূর্বক আমাদিগকে বিতরণ করিয়াছ, অশেষ দুর্গতি ও নৈরাজ্যের মধ্যে মহিমময় অতীতকে স্মরণ করাইয়া আশা ও উদ্যমে আমাদের জীবন সঞ্জীবিত করিয়াছ, আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে সেই কথা উপলব্ধি করিয়া কৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধ চিত্তে তোমাকে প্রণাম নিবেদন করিতেছি, হে বরেণ্য, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।''[৬] ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। মণি বাগচি, *আচার্য যদুনাথ : জীবন ও সাধনা* (জিজ্ঞাসা, ১৯৭৫)

২। *যদুনাথ সরকার রচনা সম্ভার* (এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ২০১১)

তথ্যসূত্র

১। *প্রবাসী*, কার্তিক ১৩৬১

২। *যদুনাথ সরকার রচনা সম্ভার*, পৃঃ ৩

৩। *আচার্য যদুনাথ : জীবন ও সাধনা*, পৃঃ ৭৪

৪। তদেব, পৃঃ ১৫৭

৫। *প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ ১৩৬৩)

৬। *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ৫৫ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা)

ঋণস্বীকার

অধ্যাপক ড. বারিদবরণ ঘোষ।